Role of mass media in our daily lives

-Jubayer Ibn Kamal

DO NOT COPY

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গণ মাধ্যমের ভূমিকা কীরকম এই প্রশ্নে স্বাভাবিক চিন্তায় আমরা অনেক ধরণের উত্তর দিতে পারি। তবে গণ মাধ্যম ও যোগাযোগ দর্শনে আমাদের জীবনে বিভিন্ন ভাবে গণ মাধ্যমের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা এই আলোচনায় সেরকমই কয়েকটি দিক নিয়ে আলাপ করবো। যেখানে আমাদের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের কাছে কীভাবে গণ মাধ্যম ভূমিকা পালন করছে এবং গণ মাধ্যম তাদের এজেন্ডাগুলো কীভাবে আমাদের দ্বারা বাস্তবায়ন করছে তা বিশদ ব্যাখ্যা করা হবে।

গণ মাধ্যমের সাথে আমাদের সম্পর্ক শুরু হয় একদম ছোটবেলা থেকেই। যেহেতু এই মুহূর্তে টেলিভিশন, সংবাদপত্র, বেতার ছাড়াও বেশ কিছু গণ মাধ্যম বিদ্যমান রয়েছে, তাই কোন না কোনভাবে প্রত্যেকেই গণ মাধ্যমের গ্রাহক হয়ে আছে। এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেকটুকু অংশই কারণে কিংবা অকারণে গণ মাধ্যমে ব্যয় হচ্ছে। তবে সেসব ব্যয় করা সময়ের ভূমিকা কতটুকু ইতিবাচক তা দেখার আগে আমরা ফিরে যেতে চায় ইতিহাসের দিকে।

প্রথম নিয়মিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল জার্মানিতে, ১৬০৯ সালে। ১৭০২ সালে ডেইলি কুর‍্যান্ট নামে বৃটেনে প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ১৭৮০ সালে-'বেঙ্গল গেজেট' নামে। বাংলায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র ১৮১৮ সালে 'বাঙ্গাল গেজেট'। আর তৎকালীণ পূর্ব বঙ্গে ১৮৪৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় 'রঙ্গপুর বার্তাবহ'। ১৯২৫ সালে টেলিভিশন আবিষ্কার হলে গণমাধ্যম জগতে বিপ্লব সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে প্রথম রেডিও সম্প্রচার শুরু হয় ১৯৩৯ সালে আর টিভি সম্প্রচার শুরু হয় ১৯৬৪ সালে।

একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করে দেয়া প্রয়োজন যে, ষাটের দশকে পুরো পৃথিবী তো বটেই, আমেরিকা ও তার আশেপাশের অঞ্চলে প্রচুর সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছিলো। সেসময় এত বেশি সহিংসতা সংঘটিত হচ্ছিলো যে, অন্যান্য বিষয়ের মত গণ মাধ্যমের উপরও তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। আর ঘটনা চক্রে সেই দশকেই টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয়। যাত্রা শুরু থেকেই সহিংসতা প্রচারে সমানে সমান এই টেলিভশন। ১৯৬৭ সালের দিকে একটি সংস্থা গঠন করা হয় যারা সহিংসতা বন্ধে কাজ করছিলো। সেসময় জর্জ গার্বনার ও তার একটি দল ১৯৭২ সালে টেলিভিশন ও টেলিভিশনে দেখানো সহিংসতা নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। চলুন আমরা দেখে আসি, ইতিহাসের সেই সময়টায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে সহিংসতার পরিমান এবং সে অনুযায়ী একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব।

জর্জ গার্বনার ও তার দল লক্ষ্য করেন, প্রাইম টাইম অর্থাৎ যে সময়টায় সবচেয়ে বেশি দর্শক টেলিভিশনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, সেই সময়টায় প্রতি ঘন্টায় প্রায় পাঁচ থেকে ছয়টি সহিংস দৃশ্য দেখানো হয়। এ তো গেলো প্রাপ্ত বয়স্ক দর্শকদের কথা। যদি শিশুদের দিকেও ফিরে তাকানো যায়, তবে প্রায় প্রতি ঘন্টায় কার্টুন, এনিমেশনের মত শিশুতোষ আয়োজনগুলোতেও সহিংস দৃশ্যের সংখ্যা আরও পাঁচ গুন বেশি!

উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত পৌছতে একজন মানুষের গড়ে প্রায় ১৩ হাজার সহিংসতা দেখে থাকেন! সত্তরের দশকের শুরুতেই জর্জ গার্বনারের এই প্রতিবেদন একটি (Caultivation Theory) তত্ত্বকে সামনে নিয়ে আসে। সেখানে জরিপের দ্বারা বেরিয়ে আসে টেলিভিশনের দু'ধরনের দর্শককে।

DO NOT COPY

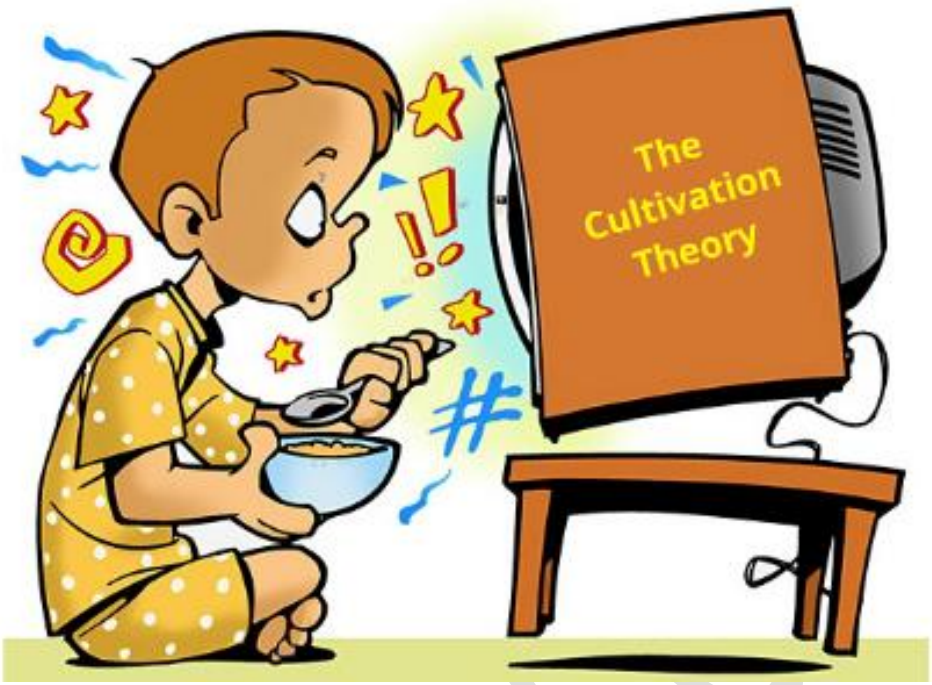

শিশুদের কার্টুনেও ঘন্টায় ২০টির বেশি সহিংসতা দেখানো হয়

- Light Viewer
- Heavy Viewer

লাইট ভিউয়ার বলতে মুলত যারা দিনে গড়ে দুই ঘন্টারও কম সময় টেলিভিশন দেখেন তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। দেখা যাচ্ছিলো, কিছু মানুষ অনধিক দুই ঘন্টা টেলিভিশন দেখলেও, কিছু কিছু দর্শকের কাছে টেলিভিশনের সঙ্গে যুক্ততা দিনে প্রায় দুই ঘন্টারও অনেক বেশি হয়ে থাকে। এ কারণে টেলিভিশনে দেখানো সহিংসতার দৃশ্যগুলোর প্রভাবও তাদের মধ্যে অনেক বেশি পরছে। শিশু-কিশোরদের মধ্যে টিভিতে দেখানো দৃশ্যগুলোকে অনুকরণ করতে দেখা যাচ্ছে। বড়দের মধ্যেও সুযোগ পেলে নিজের মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ‘হিরো’ বেরিয়ে আসার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো উগ্রতা ও নেতিবাচকতায় রূপ নিচ্ছে।

শিশুদের মধ্যে অনুকরণের এই প্রবনতা গণ মাধ্যমের এজেন্ডা সেটিংয়ে খুব ভালোভাবে কাজে লাগছে। কারণ এই তত্ত্বের মুল কথা হলো, গ্রাহক বা দর্শক মুলত একধরণের চাষের জমি, যেখানে গণ মাধ্যম তাদের নির্ধারিত এজেন্ডাগুলো বীজের মত করে ছড়িয়ে দেয়। এবং অপেক্ষা করতে থাকে একসময়ে সেটি অঙ্কুরে রূপ নেয়ার।

DO NOT C

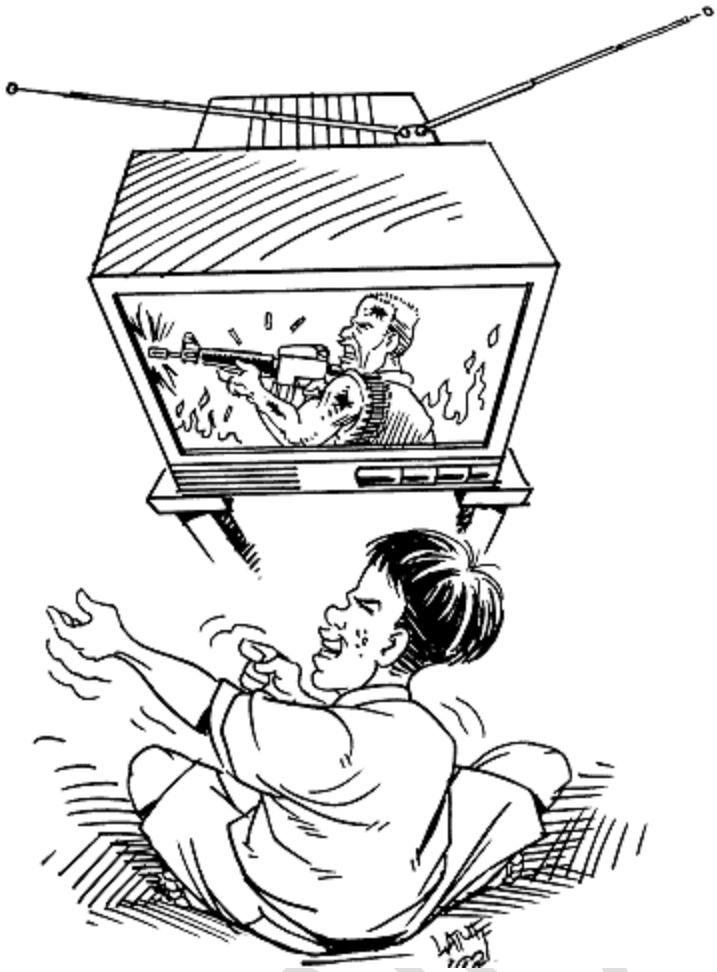

এই আলাপ থেকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে গনমাধ্যমের ভূমিকার এক ভিন্ন ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি আমরা দেখতে পাই। আমরা যদি পুরো বিষয়টিকে সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করতে চাই তবে দেখতে পাবো- প্রথমত এতে করে আসন্ন ভবিষ্যতে দর্শকের স্বয়ং বাস্তব কোন সহিংস ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবার ঘটনা ঘটতে পারে।

দ্বিতীয়ত, রাতের বেলা বা নির্জন রাস্তায় একা হাটতে থাকার মত মানসিক পরিস্থিতি আর থাকে না। এক ধরণের অদৃশ্য উদ্বেগ জন্ম নিতে শুরু করে। তৃতীয়ত, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকান্ডের উপর আস্থা কমতে শুরু করে। যেটি জনজীবনের শান্তি নষ্ট করতে বেশ কার্যকরী।

এবং সবশেষ চতুর্থ ভাগে দেখা যায়, মানুষের একে অপরের মধ্যে একটি অবিশ্বাস তৈরি হয়। যা দৈনন্দিন জীবনের জন্য ভয়ংকর এক বার্তা। তার মানে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক যাত্রাকে একটি আতঙ্কিত ও অনিরাপদ করার ব্যাপারেও গণ মাধ্যমের ভূমিকা খুব বেশি।

আমরা এবার একটু ভিন্নভাবে গণ মাধ্যমের ভূমিকা জনজীবনে কীভাবে পরে, তা দেখতে চাই। এজন্য মানুষের মনস্তত্ব নিয়ে কাজ করা বিখ্যাত দার্শনিক ফ্রয়েডের একটি ধারনার দিকে নজর দিতে হবে। ফ্রয়েড মানুষের মনের চাহিদাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন- ইড, ইগো এবং সুপার ইগো দিয়ে ব্যাখ্যা করা দ্বারা। এখানে ইড অংশটি মুলত মানুষের মনে আদি সত্ত্বা, সে শুধু ইচ্ছেমত চায় কোন কিছু না ভেবেই। অপরদিকে সুপার ইগো হলো আমাদের নীতি বা নৈতিকতা। যে কিনা সবার আগে ভাবে, এটা নৈতিক জায়গা থেকে কতটুকু সমর্থনযোগ্য। সর্বদায় ইড এবং সুপার ইগোর মধ্যকার যে দ্বন্দ্ব, সেটিকে সমান্তরাল ভাবে শান্ত করার চেষ্টা করে ইগো অংশটি। আমরা বিভিন্ন তত্ত্ব ও মিডিয়া বাস্তবতায় খেয়াল করলে দেখি, মানুষের ইগো অংশটি ভোতা করে দিতে কাজ করে থাকে গণ মাধ্যম।

আমরা আমাদের এই আলোচনার শুরুতে কাল্টিভেশন তত্ত্বেই দেখেছিলাম, গণ মাধ্যমের নিজস্ব এজেন্ডাগুলো ছড়িয়ে বীজ হিসেবে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য গ্রাহক বা দর্শকদের চাষাবাদের জমি হিসেবে তার গন্য করে। এখন এই চাষাবাদের জমিগুলোকে উর্বর করতে ইগোকে ভোতা করে দেয়াটা জরুরি। কিন্তু সেটা কীভাবে?

DO NOT COPY

মাঝে মাঝেই দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোকে পাশ কাটিয়ে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে গণ মাধ্যম মাতামাতি শুরু করে। এই যে এক প্রকার সস্তা বিনোদনে মশগুল রেখে মুল বিষয় থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখার ব্যাপারটি, গণ মাধ্যমেই শক্তিশালী ভাবে করতে দেখা যায়।

যেহেতু গণ মাধ্যমের এজেন্ডাগুলো ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে তারা এরকম অনুকুল পরিস্থিতি ছড়িয়ে দিতে চায়, তাই তারা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দর্শকদের মধ্যে এজেন্ডাগুলো ঢুকিয়ে দেয়। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হলো, ম্যাজিক বুলেট। ১৯২০ সালে এই এই তত্ত্বের ধারণা দেয়া হয়। মুলত মানুষের শরীরে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে যেভাবে একটি ছোট অংশ থেকে পুরো শরীরে কিছুকে ছড়িয়ে দেয়া যায়, তেমনি মিডিয়া ক্ষুদ্র একটি প্রচারের মাধ্যমে জনগনের বড় অংশকে প্রভাবিত করতে পারে। ম্যাজিক বুলেট থিওরি এরকমই একটি ধারণা প্রদান করে। যার মাধ্যমে যে কোন ধরণের 'প্রোপাগান্ডা' সহজেই সফল হয়ে থাকে।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, গণ মাধ্যম কি সব সময় নেতিবাচকভাবেই প্রভাবিত করতে চায়? অন্যভাবে প্রশ্নটি করলে, প্রোপাগান্ডা শব্দটি কি শুধু নেতিবাচক? উত্তর আসলে- না। সব সময় নেতিবাচক কাজ করে না। যদি প্রোপাগান্ডার প্রকারভেদগুলোর দিকেও নজর দেয়া হয়, তবে আমরা দেখতে পাবো- তিন ধরণের প্রোপাগান্ডা। সেগুলো হলো- ১. ব্ল্যাক প্রোপাগান্ডা, ২. হোয়াইট প্রোপাগান্ডা, ৩. গ্রে প্রোপাগান্ডা।

ব্ল্যাক প্রোপাগান্ডা বলতে বোঝায় মিথ্যে তথ্য দ্বারা জনমত গঠন। যেমন আগেও বহুবার বহু সরকার যুদ্ধকে জাস্টিফাই করতে এরকম প্রোপাগান্ডাকে কাজে লাগিয়েছিলেন। যেমন আমেরিকানরা ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভিডিও দ্বারা ব্ল্যাক প্রোপাগান্ডা করেছিলেন।

হোয়াইট প্রোপাগান্ডা মুলত মিথ্যে কোন তথ্য নয়। বরং সত্য তথ্যের প্রচারের দ্বারা অন্য কোন একটি ইস্যুকে ঢেকে নতুন এজেন্ডাকে সামনে আনা। যেমন আমাদের দেশের প্রশাষন মাঝেমাঝেই তাদের বিরুদ্ধে ওঠা কোন অভিযোগ ঢাকতে সামনে কোন না কোন সংবেদনশীল ইস্যু নিয়ে হাজির হন।

গ্রে বা ধুসর প্রোপাগান্ডা বলতে বোঝায় যে ক্ষেত্রে সোর্স বা উদ্দেশ্য নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি চলে। যেমন ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারিতে প্রেসিডেন্টপ্রার্থী ধরা পরার পর বোঝা যাচ্ছিলো না এই প্রোপাগান্ডার কারণ কী বা এর উৎস কী! এই ধরণের প্রোপাগান্ডাকে ধুসর প্রোপাগান্ডা বলে।

আলোচনা যেদিকে মোড় নিচ্ছে তাতে মনে হতে পারে, কেউ তো তবে এই প্রভাব থেকে বাঁচতে পারবে না? কিন্তু কথাটা সত্য নয়। দৈনন্দিন জীবনে গণ মাধ্যমের এই প্রোপাগান্ডার প্রভাব থেকেও বেঁচে থাকা সম্ভব। কীভাবে?
এখানে একজন তাত্ত্বিকের মতামত নিয়ে আসা জরুরি। John Dewye's concept অনুযায়ী, চাইলেই সব দর্শককে এরূপ প্রোপাগান্ডার আওতায় আনা সম্ভব নয়। সেজন্য দরকার জনগনকে আরো বুদ্ধিভিত্তিক চর্চার মধ্যে নিয়ে আসা। তার ধারণা এরকম প্রোপাগান্ডা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দর্শক বা জনগন ওত গভীর চিন্তা করেন না এবং সামনে যা আসেন তাই উদ্দীপক হিসেবে মেনে নিয়ে মানিয়ে ফেলার প্রবনতা থেকে রক্ষা পেতে হলে স্বমহিমায় শিক্ষা ও বুদ্ধিভিত্তিক চর্চা জরুরী।

তবে, প্রোপাগান্ডার এই নেতিবাচকতা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার ধারণা সামনে এলেও, আলাপের মুল বিষয়বস্তু তথা দৈনন্দিন জীবনে গণ মাধ্যমের প্রভাব যে এতটা বেশি, তা কল্পনা করাও মুশকিল। শুধুমাত্র

DO NOT COPY

সহিংসতা, প্রোপাগান্ডা বাস্তবায়নই নয়; বরং গণ মাধ্যমের প্রভাব কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনকে মুলধারা থেকে একদম কোণঠাসা করে দিতে সক্ষম। একটি পুরো জাতি বা গোষ্ঠীকে যে কোন বিষয়ের প্রতিবাদের পরিবর্তে একদম নীরব করে দেয়। কীভাবে?

এই বিষয়টি বুঝতে হলে আমাদের Noelle Neumann নামের ব্যক্তির ধারণাটি ধার নিতে হবে। তিনি মুলত তিনটি অংশ দ্বারা একটি গোষ্ঠিকে পুরোপুরি নীরব করে ফেলার প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন। সেগুলো হলো- I'm dominated, Silence, Isolated। পুরো প্রক্রিয়াটা সহজ করে চিন্তা করলে যেই ব্যাখ্যাটা দাঁড়ায় তা কিছুটা এরকম- যখন কোন গোষ্ঠী বুঝতে পারে তার উপর নিপীড়ন মুলক কর্মকান্ড করা হয়েছে তখন তিনি ধীরে ধীরে নীবরতার পথ অবলম্বন করেন (I'm dominated)। যেহেতু নীরব দল দেখে মিডিয়া তাদের পক্ষে খুব কম কথাই বলছে, তাই তারা নিজেদের নীরতবতা লুকিয়ে ফেলে, এবং চাইলেও তাদেরকে জাগানো সম্ভব হয় না। মিডিয়ার উদাসীনতা যদি ভুক্তভোগীকে নীরব করিয়ে রাখে তবে অন্যরা তা দেখে প্রভাবিত হয় এবং তারাও এই বিষয়ে নীরব ভূমিকা অবলম্বন করতে দেখা যায়। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হলো, সময়ের সাথে সাথে এই নীরবতা এমনভাবে জেকে বসে যে, রাজনৈতিক কোন বিশ্লেষণে তাদের উপস্থিতি হারিয়ে যায়।

তাই মোটাদাগে এই তত্ত্ব দ্বারা আমরা বুঝি মাত্র তিনটি ধাপে ভুক্তভোগী যে কোন গোষ্ঠী মিডিয়ার উদাসীনতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেদের ব্যাপারেও নীরব বনে যায়। প্রথমে তারা নিজেদেরকে ভুক্তভোগী মনে করে, দ্বিতীয় ধাপে তারা কিছুটা চুপ হয়ে যায়। এবং সর্বশেষ ধাপে, তারা নিজেদেরকে আইসোলেটেড করে নীরবতাকে আপন করে নেয়।

এই আলোচনায় দৈনন্দিন জীবনে গণ মাধ্যমের প্রচলিত ভূমিকাগুলোকে পাশে রেখে খানিকটা আড়ালে থাকা শক্তিশালী প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গণ মাধ্যমের শক্তি ও দৈনন্দিন জীবনে তার প্রভাব যে কতখানি তা হয়তো এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় কিছুটা আঁচ পাওয়া গেছে। আদতে তা আরও শক্তিশালী ও দৈনন্দিন জীবন যাত্রার আলোচনায় অনেক বেশিই প্রাসঙ্গিক।

DO NOT COPY

তথ্যসূত্রঃ-

১. https://www.simplypsychology.org/cultivation-theory.html
২. https://online.alvernia.edu/articles/agenda-setting-theory/
৩. https://web.asc.upenn.edu/gerbner/archive.aspx?sectionID=39&packageID=165
৪.https://www.mentalhelp.net/child-development/television-violence-content-context-and-consequences/
৫. ক্লাস লেকচার এবং ইন্টারনেট